বাংলা সাময়িক পত্র সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ

অশোককুমার রায়

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৬৬ বছর পরেও তাঁর চিন্তা - ভাবনা তথা রচনা সম্ভার যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি বহুক্ষেত্রেই অপরিহার্য। পত্র - পত্রিকার উদ্ধৃতির বহুল ব্যবহার লক্ষনীয়। অথচ একদিন তিনি নিজেই সম্পাদনা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, যার অজস্র বৈশিষ্ট্য একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই আম রা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি থেকে দেখতে পাবো। বিস্ময়কর রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী ধারার মধ্যে তাঁর সম্পাদক পরিচয়টি কিন্তু তুচ্ছ নয়। বরং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় নিবন্ধেও তত্রস্থ তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে দেশ - কালবোধ, মানবচেতনা ও বিশ্বভাবুকতা উপলব্ধি করতে পারি। শুধু তাইনয়, তাঁর সৃজনশীলতাকে বিচিত্র পথগামী করতে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর সাহিত্য ও সাময়িক পত্র সম্পাদনা।

আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির একটি কালানুক্রমিক সূচি এখানে দিলাম যা' থেকে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে যে দীর্ঘ কাল সম্পাদনার গু দায়িত্ব যুক্র থাকলে নিজের লেখার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবেই। তাই দেখা যায় যে আগ্রহ এবং যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র ‘বঙ্গদর্শন’ ছাড়া আর কোন পত্রিকারই সম্পাদনার দায়িত্ব বেশিদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি।

১। সাধনা (মাসিক) চতুর্থব অগ্রহায়ণ, ১৩০১ - কার্তিক, ১৩০২।
২। ভারতী (মাসিক) ২২ বত; বৈশাখ - চৈত্র, ১৩০৫।
৩। বঙ্গদর্শন (মাসিক) ১ম - ৫ম বর্ত; বৈশাখ - চৈত্র, ১৩০৮ - ১৩১২।।
৪। ভাণ্ডার (মাসিক) ১ম - য় বর্ষ, বৈশাখ - চৈত্র, ১৩১২ - ১৩১৪।।
৫। তত্ত্ববোধিনী (মাসিক) ৬৮-৭০ বর্ষ, বৈশাখ - চৈত্র, ১৩১৮ - ১৩২১।।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চব্বিশ তিনি নামে না হলেও কাজে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ছোটদের জন্য ‘হাউস জার্নাল’ ‘বালক’ পত্রিকা সম্পাদনায় নিজেকে যুক্ত করেন। বালক - এর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী। ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হয় এই সচিত্র মাসিক পত্র ‘বালক’। সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র, সরলা, প্রতিভা, ইন্দিরা প্রভৃতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এই বালক পত্রিকাতেই। কিন্তু একবছর পরেই সম্পাদক জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী কলকাতা থেকে চলে যাওয়ায় ‘বালক’ ঠাকুরবাড়ির অপর পত্রিকা স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘ভারতী ও বালক’ নামে ১২৯৯, চৈত্র পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখে। ১৩০০ - বৈশাখ থেকে আবার ‘ভারতী’ নামে প্রকাশিত হয় --ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’র গোড়ার ছয় সপ্তাহ ঐ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

‘বালক’ ও ‘সাধনা’র মধ্যবর্তী সময়ে কবি ‘সপ্তাহ’ নামে একটি সংবাদ - সাহিত্য সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেই সাপ্তাহিক পত্রটি আদৌ প্রকাশিত হয়নি। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে

১৮৮৭ সালে লেখা কবির পত্র দ্রষ্টব্য। যাইহোক ‘সপ্তাহ’ বের না হওয়ায় সংবাদপত্র দপ্তরে উপবিষ্ট কবিকে দেখার সুযোগ পেলাম না আমরা।

‘সাধনা’ পত্রিকাই তাঁর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। এবার আমরা সেই কথাতেই আসছি। ‘সাধনা’র সম্পাদক রূপে রবীন্দ্রনাথ তুলনামুলক সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা সাহিত্যের নতুন পথরেখা সৃষ্টি করেন। তিনি কেবল সাধনা পত্রিকার সম্পাদনাই করতেন না, প্রতিটি লেখা খুঁটিয়ে পড়ে বর্জন ও পরিমার্জন করতেন, লেখাগুলির প্রুফশিটও নিজেই সংশোধন করতেন। তার চাইতেও বড় কথা, ঐ পত্রিকার অধিকাংশ লেখা তাঁকেই লিখতে হত। এই প্রসঙ্গে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা কবির এক চিঠি থেকে তাঁর নিজের কথায় জানা যায়, -যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময়ে ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রধানত এই পত্রিকাতেই আমার গদ্য লেখা অভ্যস্ত হয়। ...সোনার তরীর কবিতাগুলি প্রথম সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন - চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। ‘সাধনা’ পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে-ই লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভুরি পরিমাণে ছিল।

...সাধনা বাহির হইবার পূবেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ কমল বসু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীন্দ্রচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণ কমল বাবুও সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহে আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই, ছয় সপ্তাহ কাল লিখিয়া ছিলাম। ‘সাধনা’ চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছু দিন পরে এক বৎসর ‘ভারতী’র সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিত হয়।

....আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধ ‘বঙ্গদর্শন’ পুনজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনা ভারগ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। ... বঙ্গদর্শন পাঁচ বছর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি।”

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে জড়িয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পত্রিকা সম্পাদনায় সক্রিয় ছিলেন। উপরোক্ত ঐ চিঠিতে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনার চতুর্থবর্ষে ‘ভান্ডার’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকে (বৈশাখ,১৩১২-আষাঢ় ১৩১৪ পর্যন্ত) সম্পাদনা করলেও আশ্চর্যজনক ভাবে কোন উল্লেখ নেই।

এর চার বছর পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে পরিচালিত ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালেই তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই পত্রিকায় তিনি ধর্ম জিজ্ঞাসা মীমাংসার চেষ্টা করেন। এই পর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ ও ‘ভারত ইতিহাসের ধারা’ দুটি অনন্য সাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত রচনাটিতে কবির প্রতিপাদ্য ছিল, ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে

সাধনার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা হ'ল মিলনের মন্ত্র। ভেদের মন্ত্র নয়। এই ভারতীয় ঐক্যসত্তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্যান জ্ঞান।

এবার আমরা রবীন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকাগুলির একটু বিশদ পরিচয় দেব যাতে পাঠক সাময়িক পত্র সম্পাদনায় রবীন্দ্র চিন্তা -ভাবনার মৌলিকতা তথা সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যের নব নব বিভাগে গঠন ও পরিভাষা সৃষ্টিতে তাঁর বিপুল অবদান আমাদের বিস্মিত অভিভূত করে।

'সাধনা' পত্রিকা -টি হল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদিও ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধনার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম - দ্বিতীয় - তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক, তবু 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকেই এসব কথার সঙ্গেই জানা যায় প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর সকল কিছুর সঙ্গে যুক্ত। সাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে ভালবাসার টান ছিল সে কথা তিনি অকপটে জানিয়েছেন একাধিক লেখায়। তিনি চেয়েছিলেন এটিকে আদর্শ স্থানীয় মাসিক পত্রিকা করে তুলতে। শিলাইদহে জমিদারি কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে 'সাধনা'র জন্য নানা লেখা গিয়েছেন, পত্রিকার বিষয়ে সর্বদা ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথকে বুদ্ধি - পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময় তিনি যেমন সফল ভাবে জমিদারির তদারকি করেছেন তেমনি সৃষ্টি করেছেন গল্পগুচ্ছের অনেক অনবদ্য গল্প। আবার সাধনার জন্যে ভেবেছেন - লিখেছেনও যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতাও করেছেন নিজস্ব ভাবনায় - নিপুণ ভাবেই।

সাধনা পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরর আন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ক কতটাগভীর ছিল রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ) একাদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৯২ - ৯৩ তে মুদ্রিত একটি পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সালের ৩রা মার্চ পুণাথেকে তিনি সাধনা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথকে লেখনে -"দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে -- চৈত্র মাসের সাধনার জন্য যে ডায়েরীটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহু ভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুটা এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয়ই শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মত বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয় সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। ...আমি নিশ্চয় জানি আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে, ক্রমে ক্রমে আমি দেশের মন হরণ করে আনব - নিদেন আমার দু'চারটি কথা তার অন্তবে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনেহয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্য একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না - একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সাহায্যকারী পাইতো ভালই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।"

সাধনা পত্রিকার মুখবন্ধে লেখা হত "আগে চল্ চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই,
আগে চল্ চল্ ভাই।

এই আহ্বান ছত্র কয়টি রবীন্দ্রনাথেরই। ১৫ই অগ্রহয়ণ ১২৯৮ (সোমবার ৩০ নভেম্বর, ১৮৯১) সাধনার প্রথম সংখ্যা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল। ঠিকানা ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২; লেখক ছিলেন- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) (প্রবন্ধ কাগজ) (সাময়িক সার সংগ্রহ নাইটিনথ সেঞ্চুরী) বৈজ্ঞানিক সংবাদ গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সার দাম্পত্য, উটপক্ষীর লাথি, যাত্রা আরম্ভ) সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ভারতী, নব্যভারতী, সাহিত্য আশ্বিন ও কার্তিক। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' অবলম্বনে চিত্র -- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। প্রথম সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪০ পৃষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'সাধনা'র অলঙ্করণের ভার দেওয়া হয়েছিল গগনেন্দ্রেনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। প্রতি সংখার দাম হয়েছিল এক টাকা। পরে অর্থাভাবে অলঙ্করণ -চিত্রাবলী বাদ দিতে হয়। হিতবাদী পত্রিকার মত শেয়ারের মাধ্যমে সাধনার জন্য অর্থসংগ্রহ হয়েছিল। তবে তাকে ব্যবসায়িক অর্থে শেয়ার না বলে চাঁদা বলাই ঠিক। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় চাঁদা দাতাদের নামের তালিকাও ছাপা হত। দুপাতা বিজ্ঞাপন থাকত। একপাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন এবং অপর পাতাটিতে লালবাজার পুলিশ আদালতের বিজ্ঞপ্তি ও ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্সের হারমোনিয়াম ও আর্গিন যন্ত্র - এর বিজ্ঞাপন নিয়মিত ছাপা হত। ২য় বর্ষে ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে সাধনায় 'প্রসঙ্গ কথা' নামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যুক্তি নিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। পৌষ সংখ্যায় তিনি শিক্ষার হেরফের নামে একটি মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখলে তা' পড়ে আলোচনায় যোগ দেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরু দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু পত্রাকারে লিখিতভাবে। সাধনার প্রায় বারোআনা লেখাই রবীন্দ্রনাথের। সম্পাদক হওয়ার পরও সেই ধারাই বজায় থাকে। প্রথম থেকেই কার্যত সম্পাদক থাকলেও অগ্রহায়ণ, ১৩০১ থেকে অর্থাৎ সাধনার চতুর্থ বর্ষের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চতুর্থবর্ষের প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সংখ্যার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চতুর্থবর্ষের প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সংখ্যায় ১১টি লেখার মধ্যে ৬টি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা'য় লেখকদের নাম কোথাও ছাপা হত না ও বর্ণানুক্রমিক সূচিতেও লেখকের নাম নেই -- ফলে অনেক লেখার পরিচয় এখনও উদ্ধার করতে পারেননি গবেষকবৃন্দ। বিশিষ্ট গবেষক ও রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের মতে 'এখনও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত পত্রিকা গুলিতে তাঁর বেশ কিছু রচনা অচিহিত ও অগ্রন্থিত থেকে গেছে'।

সাধনার জন্য চার বছর ধরে তিনি এত লেখা লিখে ছিলেন যে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষের ক'টা মাস যেন আর চলছিল না। সাধনার শেষ সংখ্যা ১৩০২ সালের ভাদ্র - আশ্বিন - কার্তিক একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এভাবেই কবির স্বপ্নের 'সাধনা' চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা লেখে -- ''যে দেশে ''সাধনা'র মত উষ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র বিলুপ্ত হইতে পারে, সেদেশ নিশ্চয় অত্যন্ত দুর্ভাগা।''

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেও তাঁর ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন পত্রিকার

পরিকল্পনাকার ও প্রকৃত পরিচালক। ছোটভাই রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই এই পত্রিকার সহয়োগী হন। ভারতী ভারতীয় জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের পথ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকলে এবং পরবর্তীকালে ১৩০৮ থেকে ১৩২১ সালের মধ্যে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য স্বাদেশিকতা মূলক রচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, রাধাকান্ত বসু , রমেশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী,অনুপমা দেবী প্রমুখের দেশাত্মবোধক রচনা প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। এছাড়া জ্যাঠা, শ্রীপাগল ও শ্রীস্বদেশী ছদ্মনামেও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্র, চয়ন ও রাজ্যের কথা প্রভৃতি বিভাগগুলি ছিল তথ্য সমৃদ্ধ এবং পত্রিকা সম্পাদকদের ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগে তিন বছর (১৩০২-০৪) স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'ভারতী' সম্পাদনাব একটি বছরকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাল বলা যায়। এই সময় তিনি সাময়িক, রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে এবং সাহিত্যবিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই সঙ্গে পাঠকদের চাহিদা মেটাতে গল্পও লেখেন। ঐ বছরে তিনি মাত্র কয়েকটি গান ও দু'চারটি কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁর কোন গ্রন্থই মুদ্রিত হয়নি।

সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা হত 'প্রসঙ্গকথা' ---দেশের শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চার যুক্তি নির্ভর অথচ তীক্ষ্ম সমালোচনা করা হত এই বিভাগে। রবীন্দ্রনাথের সময় 'ভারতী' -কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজযন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক স'ডাক মূল্য তিন টাকা ছ'আনা।

এক বছর 'ভারতী' সম্পাদনা করে রবীন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করলেন। এ সম্পর্কে তিনি চৈত্র, ১৩০৫ সংখ্যায় লিখেছেন --''এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল ত্রুটির যত কিছু কৈফিয়ৎ প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী' কেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে।...ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। ...ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।''

রবীন্দ্রনাথ ভারতী সম্পাদন ত্যাগ করলেও ভারতীকে ত্যাগ করেননি। তবে অনেক সময় তিনি নানা অসুবিধার জন্য ভারতীতে নিয়মিত লিখতে পারেননি। তিনি সম্পাদকত্ব ত্যাগ করলে সরলাদেবী সম্পাদক হন বৈশাখ, ১৩০৬ থেকে একক ভাবে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত। তারপর আরো অনেক দিন নিয়মিত ভাবেই প্রকাশিত হয়ে ভারতী তার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্ণ করে আশ্বিন, ১৩৩৩ সংখ্যা (বাংলা

সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয় এবং তারপর মাত্র আর একটি সংখ্যা কার্তিক, ১৩৩৩ প্রকাশিত হয়েভারতী চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এরপর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' (বৈশাখ, ১২৮২ -১২৮৯ পর্যন্ত যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) পত্রিকার নবপর্যায় সম্পাদনায় স্বীকৃত হন। এই ঘটনার ত্রিশ বছর পর স্মৃতিচারণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গদর্শনের নব পর্যায় আমার নাম প্রস্তাব করা হলে তা'তে আমার মনের সমর্থন ছিল না। কোন পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা। আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে আমি কখনো জয়লাভ করতে পারিনি, এবারও তাই হল।''

রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করায় শ্রীশচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশে শ্রীশচন্দ্রের এই আগ্রহের নেপথ্যে তাঁর একটি মনোবেদনার কারণ আছে। তা' হল সঞ্জীব চন্দ্র যখন অনিয়মিত ভাবেও বৈশাখ - চৈত্র, ১২৯৮-এর পর আর বঙ্গদর্শন প্রকাশ করতে পারলেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিতে শ্রীশচন্দ্র তখন সম্পাদক মনোনীত হয়ে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ১২৯০ মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। মাঘ ১২৯০ সংখ্যার মধ্যে দিয়ে প্রথম পর্যায়ে বঙ্গদর্শন পত্রিকাপ্রকাশ বন্ধ হয় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশেই। অভিযোগ ছিল ভাল লেখার অভাবে পত্রিকার মান দ্রুত নেমে যায়। আর একটি কারণও ছিল। সম্পাদক শ্রীশচন্দ্রকে এই সময়ে চাকরি উপলক্ষে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়, ফলে বঙ্গদর্শনের জন্যে তিনি পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি।

যাইহোক এ'সবই হল দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গদর্শন প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীশচন্দ্রের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় ১৮ বছর পর হলেও বঙ্গ দর্শন পুনর্জীবীত হওয়ায় তৎকালীন বাংলা সাময়িক পত্র সমূহ তাকে সাদরে বরণ করে নেয়। বৈশাখ, ১৩০৮থেকে চৈত্র, ১৩১২ এই পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন - এর সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদর্শন তারপরেও ১৩২১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাভার নেওয়ার পর থেকেই বহু লেখকের সমাবেশ হয়েছে। গল্প উপন্যাস - কবিতা - প্রবন্ধ - ভ্রমণকাহিনী - স্মৃতিকথা অনুবাদ - গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণায় সমৃদ্ধ হয়েছিল নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন'। এত বৈচিত্র্য আদি বঙ্গদর্শনে ছিল না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার - এর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলেও এবং আরও নানা বিষয় থাকলেও কবিতা এবং প্রবন্ধেই ছিল নবপর্যায়ের বিশিষ্টতা। উপন্যাসের বিষয় এবং শিল্পকলায় বঙ্কিম যুগ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে কবিতার মান উঁচু ছিলনা, সংখ্যায়ও ছিল অল্প। নবপর্যায়ে কবিতার মান এবং সংখ্যাও দুই-ই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'-র এবং 'খেয়া'-র অনেক কবিতাই নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছে। বঙ্গদর্শনে সম্পাদকের লেখায় লেখকের নাম থাকত না। কবিতাতেও ছিল না। তবে লেখক নামহীন অন্যের কবিতাও বঙ্গ-দর্শনএ মুদ্রিত হয়েছে। এইসময়ে যাঁরা কবিতা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রধানত অনুবাদ) প্রিয়ম্বদা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী,

দেবেন্দ্রনাথ সেন, বসন্তকুমার দাস, প্রেমানন্দ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র রায়, গোবিন্দচন্দ দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি অনেকের কবিতাই শনাক্ত করা সম্ভব হলেও সব কবিতার কবির হদিশ মেলেনি। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' -একবিতার গুরুত্ব যেমন বেড়ে গিয়েছিল, গল্প উপন্যাসের স্থান সেই তুলনায় তত ছিল না। এখানে অবশ্য স্মরণ করা যেতে পারে যে বঙ্কিম যুগের পর বঙ্গদর্শনে উপন্যাসের নতুন রীতির সূত্রপাত হয়েছিল, সে রীতিই বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছে। এর সূচনা বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি'থেকে। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৮ -এর বৈশাখ থেকে ১৩০৯-এর কার্তিক পর্যন্ত। মাঝে ১৩০৮ এর আষাঢ় এবং অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়নি। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলতে যা' বোঝায় 'চোখের বালি' ছিল তাই। রবীন্দ্র নাথেব 'নৌকাডুবি' উপন্যাসও প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে ১৩০১ এর বৈশাখ থেকে ১৩১২-র আষাঢ় পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি'ও'নৌকাডুবি' ছাড়া আর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তুলনামূলক ভাবে গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনা কালে ২৩টি। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প 'দর্পহরণ (ফাল্গুন, ১৩০৯) ও 'মাল্যদান' (চৈত্র, ১৩০৯) গল্পদুটি 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত আছে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ বিভাগ খুবই সমৃদ্ধ ছিল। কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন তেমনি গুরুত্ব দেন প্রবন্ধ প্রকাশে। ২৮০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনা কালে। এসব প্রবন্ধ যেশুধু বিবরণাত্মক তা নয়, প্রবন্ধগুলি বৈচিত্র্যে এবং বিশ্লেষণে উন্নতমানের ছিল। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ বিশুদ্ধ সাহিত্যলোচনার আদর্শস্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চৈত্র, ১৩১২ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের শেষ সংখ্যা। এরপর শৈলেশচন্দ্র১৩১৩-র বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'বঙ্গ দর্শনের শেষ সংখ্যা। এরপর শৈলেশচন্দ্র ১৩১৩-র বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হলেও বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকের নাম ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে শৈলেশচন্দ্রকে যে পত্রটি দেন ১৩১৩-র বৈশাখ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। সেই পত্রটি এখানে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থে দেওয়া হল"...নব পর্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসরকাল চালন করিয়া বর্তমান বৎসরে আমি সম্পাদক পদ হইতে নিস্কৃতি গ্রহণ করিতেছি। এক্ষণে আমি বিশ্রাম প্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।
--- শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

তারপর 'বঙ্গদর্শন' ১৩১৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১৩-১৯ শৈলেশচন্দ্রই সম্পাদকতা করেন বঙ্গদর্শনের।১৩১৩ -র বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' নামে একটি ভাবোদ্দীপক কবিতা প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ বর্ষ বৈশাখ ১৩১৩ সংখ্যায় নিবেদন (সম্পাদকীয়) নামে শৈলেশচন্দ্রের লেখা দিয়ে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শেষ করছি। "...নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদক রূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শন প্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়া ছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দেশ ও উপদেশে বঙ্গদর্শন প্রচারে ব্রতীরহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মুলভরসা তিনিই। তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহয়তায় 'বঙ্গদর্শন' পরিচালিত হইবে।
---শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক পদে থাকা কালেই রবীন্দ্রনাথ 'ভান্ডার' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এইপত্রিকার পরিচালক - প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারকে কেদারনাথ তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই ৭ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন করেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকেই 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমটায় রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বারংবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক হতে রাজি হন। কেন তিনি রাজি হন এভার গ্রহণ করতে সে কথা তিনি নিজেই ভাণ্ডারের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ,১৩১২) জানান, ''প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম আমাদের এই কাগজটা একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, দেশের পাঁচজন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।'' প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাই ছিল 'সূত্রধারের কথা'। সেখানেই তিনি এই বক্তব্য নিবেদন করেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৪শে এপ্রিল (১১ই বৈশাখ), ১৯০৫। সাধনা ও ভারতীর সম্পাদক থাকার সময় তাঁকে সম্পাদনা ছাড়াও পত্রিকার প্রায় সব দায়িত্বই এক হাতে পালন করতে হত। প্রথমত তিনি নিজে অধিকাংশ লেখা লিখতেন, অন্যের লেখা সংশোধন করতেন, লেখা সংগ্রহ করতেন, কিছুটা আর্থিক দায়িত্ব বহন করতেন, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি ও কমবেশি করতেন। ছাপার ভুলের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের খুঁতখুঁত মনোভাব ছিল। মুদ্রণ প্রমাদ তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না বলে নিজে হাতে প্রুফ দেখতেন। এই দিক থেকে 'ভাণ্ডার' ছিল একেবারেই অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' ছিল স্বদেশি জাগরণের মুখপত্র, কিন্তু এখনকার ভাণ্ডার সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র, এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছু বেশি দু'বছর যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা - সম্পাদনা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হত না। এই পত্রিকার পরিচালক - প্রকাশক কেদারনাথ দাশগুপ্ত পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, ''আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভান্ডারে' ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। ভাণ্ডার প্রধানত রাজনৈতিক আলোচনা মূলক পত্রিকা ছিল। দেশের বিদগ্ধজনেরা রাজনীতির পটভূমিতে অন্যান্য সমস্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মত পার্থক্য প্রকট ছিল। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবধর্ম অনুসারে কোন মতকেই চাপা দিতে চেষ্টা করতেন না। বরং তিনি চাইতেন চিত্তাকর্ষক বিতর্কের মধ্যে পাঠকরা নিজ নিজ মত গড়ে তুলুক। ভাণ্ডার গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ ও রস রচনা ছাপা হত না, কিন্তু পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক ও বিতর্কমূলক আলোচনা। ভাণ্ডারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রশ্নোত্তর। জাতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর স্থান পেত। বেশির ভাগ প্রশ্ন অবশ্য তুলতেন সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মোটকথা রবীন্দ্র সম্পাদনা পরিণতি লাভ করেছিল ভাণ্ডারে। ১৩১৪ সালের আষাঢ় পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেন। এর অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকা রাজরোষে পড়ে ও পরিচালক কেদারনাথ দাশগুপ্ত আমেরিকায় চলে যান। সাময়িকভাবে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরে দেশে সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র রূপে 'ভাণ্ডার' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ‘তত্তবোধিনী সভা’ (১৮৩৯), ‘ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ (১৮৪৩) তারপর ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ আদি ব্রাহ্ম সমাজ -এর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হলেও এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সে যুগের কয়েকজন মনীষীরও যোগ ছিল, যাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী বাঙালীর নবজীবনের প্রথম স্পন্দন বহন করে এনেছিল। উনিশ শতাব্দীতে রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারায় ব্রাহ্ম আন্দোলনও যে সমাজ সংস্কার ও যুক্তি বাদী চিন্তাধারার বাহক হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতেই অক্ষয়কুমার ধর্ম, সমাজ আর রাজনীতির প্রচলিত তত্ত্ব আদর্শের পুনর্বিবেচনার উপলব্ধি করেন। বেদের ও উপনিষদের ধারাবাহিক অনুবাদ সর্বপ্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে বাঙালি বেদের পরিচয় পায় এই পত্রিকাতেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাভাতের অনুবাদ শুরু করেন এই পত্রিকাতেই। শুধু তাই নয় বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এই পত্রিকাকেই আশ্রয় করেন। শিক্ষা স্বাবলম্বন, স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীতা প্রসারের ব্যবস্থা, মদ্যপান নিবারণ, নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। অক্ষয়কুমারের পর এক বছর সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারপর একে একে সম্পাদক হন - নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ দত্ত, আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অযোধ্যনাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অযোধ্যনাথ পাকড়াশী (দ্বিতীয়বার), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (তৃতীয়বার), -- আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অযোধ্যানায় পাকড়াশী (চতুর্থবার), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্বিতীয় বার) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। এরপর সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স পঞ্চাশ। কবি - সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবী হিসেবেই শুধু নয় সম্পাদক হিসেবেও যশস্বী। অতএব বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মাসিক পত্রিকাটির দায়িত্ব যোগ্য হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম যশকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজ। বাংলা ১৩১৮ থেকে ১৩২১ (১৮৩৩-৩৬ শতাব্দ) রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পর্ব জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেখুবই গুরত্বপূর্ণ সময় এবং কবি জীবনেও এক স্মরণীয় মুহূর্তকাল। এইসময়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে জাতীয় আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ। জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৩ সালে সুইডিস অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। বিশ্বের দরবারে একটি পরাধীন দেশের এক কবির এই প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয়বাদের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক থাকাকালেই রবীন্দ্রনাথ ২৪শে মে, ১৯১২ থেকে একটানা দেড় বছর ইউরোপ ও আমেরিকা সহ নানা দেশ সফরে যান। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই দেড় বছর পত্রিকা দেখাশুনো করতেন সহ - সম্পাদক অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্র - সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকায় যেমন তাঁর লেখাই বেশি থাকত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলা যায়। ফুলস্ক্যাপ আকারে ২২ পৃষ্ঠা পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথপ্রমুখ ঠাকুর বাড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখার সঙ্গে থাকতো শান্তিনিকেতন আশ্রমের বন্ধু, শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেনের মত বিদগ্ধ প্রবন্ধকারের লেখা। ভাণ্ডারের মত তত্ত্ববোধিনী ছিল মূলত প্রবন্ধ ও বিবিধ আলোচনার পত্রিকা।

এতে উপন্যাস, গল্প ছাপা হত না। কবিতা ও স্বরলিপি সহ গান ছাপা হত। তত্ত্ববোধিনীতে 'জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে' সহ অনেকগুলি সুপরিচিত কবিতা - গান (স্বরলিপিসহ) ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানেই 'বিলাতের পত্র' ও 'আমেরিকার চিঠি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনীই রবীন্দ্রনাথের শেষ সম্পাদিত পত্রিকা। এরপর রবীন্দ্রনাথ পত্রিকা সম্পাদনায় আর সময় দিতে পারেননি। এমন বিশ্ববরেণ্য বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটির অসংখ্য কর্মকান্ডের মধ্যেও পাঁচটি পত্রিকাকে যে এতটা সময় দিয়েছিলেন --সেই আমাদের অনেক প্রাপ্তি নয় কি?